http://www.elearninginfo.in

কাবাবগা গীতিকা

মহাশ্বেতা দেবী

এক গেলাশ চা আর একটি ছোট পাঁউরুটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে মোহিনী বলেন, কাগাবগারে কই ! চা দিয়া গেলাম, পরে যেমুন না শুনি ঠাণ্ডা কইরা চা দিছিল। আরো কই, গেঞ্জি লুঙ্গি যেমুন না কাচে, সাবান দিয়া দিমু।

যাঁকে বলেন, তিনি বলতে গেলে মোহিনীর জন্মজন্মান্তরের স্বামী । মোহিনীর যখন তিন বছর, তখনই নাকি তিনি উৎরুমির মেলায় গলার পুঁতির মালাটি সদানন্দের গলায় পরিয়ে দেন। দেখো। মাইয়া বুঝি অর পূর্ব জনমের বউ, মালাখানা কারেও দিল না, আমাগো সদার গলায়।

—জাত কুল দেইখ্যা দিছে গো !

বড়দের কথার মর্ম না বুঝে আট বছরের সদান্দন মালাটি আবার মোহিনীকেই পরিয়ে দেয়। তাতে বুড়িরা অবধি গালে হাত দেয়।

—দ্যাখ দ্যাখ। কলিতে নাকি দৈবী নাই ? নাই যদি তয় এমুন বছরকার দিনে....মহিলা ভাবাবেগে কেঁদেকেটে মোহিনীর মাকে ধরে বলেন, মিত্তিরের বেটি বসুর পোলার গলায় মালা দিল ! বয়সেও মিলে। আবাগি লো ! তর মাইয়ার বিয়া এহানেই হইব।

ছেলের মা একসময়ে বলতে গিয়েছিল, পোলাপানের কাজ দেইখা বিয়া ঠিক হয় নাই ?

কিন্তু মেয়েরা বড় হুলাহুলি করে। উৎরুমির স্নানের মেলায় এ যেন দেবতার কৌতুক। কেউ বলে, ফুল ছিটাও ! কেউ বলে, চিনির মঠ ভাইঙা এ-ওর মুখে দেউক। কেউ বলে, জোকার দে গো !

মোহিনী আর সদানন্দ কিছুই বোঝেনি।

কিন্তু অনেক পরে, সদানন্দর যখন বিশ বছর, যখন জমিদারের কাছারিতে পাটের গাঁট গোনে, তখন সে মাকে বলেছিল, বিয়া বিয়া, করো কেন ? কন্যা আমি স্বপ্নে দেইখা থুছি। আমি দেখছি স্বপনে, তুমি দেখছ চক্ষে। মোহিনীর কথা কই।

বাপও আপত্তি করেন। মোহিনীর বাবা এই জমিদারেরই আরেক কাছারিতে নায়েব। লবণ, কেরোসিন, চিনি ও কাপড় ছাড়া কিছুই কেনে না।

মা বলল, মাইয়া সাজাইয়া দিব। নাকখান যা চাপা, নয় তো মাইয়া সোন্দর। হটর হটর হাটে না, ফটক ফটক বাক্য নাই, পাকশাক জানে।

এমনি করেই বিয়ে হয়েছিল। পাড়াপড়শি বলেছিল, এই বিয়া তো অরাই ঠিক কইরা রাখছে। এই বিয়া হইতই।

মোহিনীর এখনো মনে পড়ে, কাঁঠাল কাঠের চাকি-বেলনা থেকে বাসন, কাপড়, ক্ষীর, দই, মিষ্ট, ফল, তরকারি, দশটা মানুষ বাঁকে বইতে পারে না এত জিনিশ।

জমিদার বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতেও মাছ এসেছিল শ্বশুরবাড়িতেও। উৎকৃষ্ট টাঙ্গাইল শাড়ি, সিঁদুর মাখানো টাকা।

এখন সে সব আশকেলে বাস্ কথা। একথা বাড়িতে ফনফনে অ্যালুমিনিয়ামের গেলাশে জল খেতে খেতে মোহিনী নিজেকেই বলে, তহন এক গেলাশ জল উঠাতে হাত ভারাত। একেক খান বাসন আছিল ফুল কাসার। তেমুন একখানা গেলাশ আছে তোদের ?

কেউ যদি বলে, কাকে বলো ?

—কাগাবগারে কই।

স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ আজ ষোল বছর। বাক্যালাপ ওই অলক্ষ্য কাগাবগাকে সাক্ষী মেনে।

কথা বন্ধ হত না। ছেলেরা হল দেশান্তরী, সেই দুঃখে মোহিনীকে ধরল আপনমনে বকা রোগে। আপন মনে ও বলে যেত কথা। তা নিয়ে অনেক অশান্তি, অনেক ঝগড়া।

সদানন্দ বলেছিল চল, ডাক্তারের কাছে লই। এমুনি বকা ধরছ, মানষে ভাবে পাগল-বা হইলে বুঝি !

মোহিনী জ্বলে উঠেছিল।

সব কি হল তার দোষে ? হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হতে দেশ ছাড়তে সে বলেছিল ? সদানন্দের উপযুক্ত ভাগনার হাতে সম্পত্তি বেচাকেনার ভার দিতে মোহিনী বলেছিল ? কলোনিতে সবাই উঠল এসে। সকলের অবস্থা ফিরল, মোহিনীর অবস্থা কেন ফিরল না ? আর, ছেলেরা দেশান্তরী হল কেন জবাব দাও ?

সদানন্দের মাথা হেঁট।

সম্পত্তি ভাগ্নে বেচেছিল। সদানন্দ তার কথায় ভুলে ব্যবসা করতে যায়। ফলে ভাগ্নের এখন রানাঘাটে পাকাবাড়ি, সদানন্দ আজও ধুবুলিয়া ছাড়িয়ে এক কলোনিতে।

ছেলেরা লেখাপড়া শেষ না করেই চাকরি পেল, ঘর ছাড়ল। বড়জন চটকলে, ভালই রোজগার করে। বউ, মেয়ে, নাতি, নৈহাটিতে বাড়ি।

ছোটটা ছিল বোম্বেটে। এক সময়ে সে বোমা বাঁধত, পয়সা নিত। বাপকে বলত, বিজনেস করত্যাছি।

বোম্বেটে ছেলে ঘরের ট্রানজিস্টর, সদানন্দের ঘড়ি, মোহিনীর কানফুল চুরি করে বোম্বাই পালায়।

সেখানেও সে 'বিজনেস' করছে। সে দেশের মেয়ে বিয়ে করেছে। বাপ-মাকে একবার টাকা পাঠিয়েছিল।

ছোটছেলে ছিল মোহিনীর প্রাণ। সদানন্দ বাসে চেপে কেষ্টনগর যেত, এখনো যায়, কোর্টের সামনে বসে ফর্ম লেখে আর তেমন মক্কেল পেলে জমির মামলার তদারকি করে।

বাপ বেরিয়ে গেলে ছোটছেলে মাকে স্বপ্ন দেখাত। এমন মন্দ ব্যবসা সে করবে না। বাপের মত সজনে ডাঁটা কিনেও ঘরে ফিরবে না। বাবা একেক মক্কেল ধরে বটে ! কেসের তদারকি করল, মামলায় জিতল মক্কেল। নামিয়ে দিয়ে গেল একঝুড়ি তেঁতুল, নয়তো

একথালা পাটালি গুড়।

—তুই কেমুন বেবসা করবি ?

—বাঙাল কথা ছাড়ো তো !

—কয়, মায়ের দুধ আর মায়ের ভাষা।

কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, সেই তখন মোহিনী তার ছোটছেলেকে যা বলত, এখন দেখো, সরকারই সে কথা দিকে দিকে প্রচার দিচ্ছে। মায়ের দুধ আর মাতৃভাষা দুই সমান সম্মানের।

তা ছোটছেলের নাম মনোরঞ্জন, বর্তমানে সে নাকি মনোজকুমার। আর বড়ছেলে সুখরঞ্জন এখন শুধুই রঞ্জন।

ছোটছেলে বলত, ভটভটিয়া চালাব, চোখে কালো চশমা, মানিব্যাগ খুলে তোমায় হাজার টাকা দেব।

—তাই দিস। ঘরখানা সারাই। তর বাপেও আর পারে না। এতদিন বাবদ খাটাখাটনি দ্যাশে তো এমুন...আমিও করাতকলের ঘেস আইনা গুল পাকাইতে পারি না আর।

—পাকাও কেন ?

—যা পাই ! লবণটা, তেলটা....

কিন্তু মুড়াগাছায় কোন ব্যাপারীর দোকানে বোম মেরে ক্যাশ ভাঙতে গিয়ে মনোরঞ্জন ওরফে ড্যানি, ওরফে বোম্বেটেকে ব্যাপারী চিনে ফেলে। বিচলিত মনোরঞ্জন একপাল ছাগলের মধ্যে বোমা ফেলে পালায়। এদিক-ওদিক কদিন গা-ঢাকা দিয়ে রাতে ঘরে এসে শুয়ে থাকে। সকালে ছেলে, ট্রানজিস্টর, বাপের ঘড়ি, মায়ের দুল, সবই হাওয়া হয়ে যায়।

সদানন্দ ছেলের জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে দারোগার কাছে কয়েকবার 'ও হো হো হো' শোনে।

—ও হো হো, আপনার মত সৎ সজ্জন মানুষের ছেলে বোম্বেটে হয়ে গেল, ও হো, হো, ছেলেকে মানুষ করতে হলে শাসনও দরকার, ও হো হো হো...

সদানন্দ ঘরে এসে বসে থাকে।

আর মোহিনী বিলাপ করে পাড়া জাগায়।

—যাও, কলকাতা যাও ! তার ফটো কাগজে দেও। পোলা চইলা গেল, বাপের বুকে বাজে না ?

সদানন্দ ঈষৎ হেসে বলে, সে তার পথ খুঁইজা নিছে। আমি সে পথের লাগাল পাইতাম না মনোর মা ! অহন খুঁইজা দেখো, ঘরে কিছু মাল রাইখা গেছে কিনা। তাইলে কচু বনে ফালাইতে হইব, ডোবার জলে।

—তার উদ্দেশ করবা না ?

—লাভ নাই।

—যাইবা না কলকাতা ?

—কেমন কইরা ? বুঝো না তুমি, ধরতে পারলে পুলিশে মারতেও পারে। যেখানে থাকে, বাইচা থাকুক।

—আমার বুক যে পোড়ায় !

মোহিনী সেই যে বকতে শুরু করল, রাতদিন বকত। ছেলে ওকে স্বপ্ন দেখাত গো ! দুপুরে বড়ির ঝাল আর ভাত খেয়ে মা ছেলে কত কথা বলত। মোহিনী জানত কথাগুলি অবাস্তব। তবু ভাবতে ভাল লাগত, ঘরদোর নতুন হয়েছে, সদানন্দ আর মোহিনী অত খাটে না। বস্তায় চাল থাকে, তেল-মশলা-লবণ কেরোসিন !

ছেলে আর স্বপ্ন দুই নিরুদ্দেশ।

ওর ভাবগতিক দেখে সদানন্দ বলেছিল, মাইনষে পাগল বলবে তাই চাও ? চলো ডাক্তারের কাছে লই।

আধ ঘণ্টা মোহিনী যাত্রার নায়িকাদের মত উচ্চগ্রামে ঝড়ের মত বকে গিয়েছিল।

—হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আমি করছিলাম ? দ্যাশ ছাড়তে আমি বলছিলাম ? ভাগ্গার হাতে সর্বস্ব ছাইড়া আইলা বা ক্যান ? আইলা যদি, সগলের আবুস্থা ফিরে, আমার কেন এমুন হাল ? কি আমার দৈব নির্দাশী বিয়া রে ! আইবার সময়ে বাসন-তেজস, সব ফালাইয়া, অহন কও আমি পাগল। কথা কইলে পাগল হয় ?

সদানন্দ কাতর গলায় বলেছিল, আমি সইতে পারি না রে বউ ! আমারে তুমি কাছিমকাটা কইরো না। অহন তুমি ছাড়া কেও নাই যে কথা কই, সেই তুমি আমারে আর কত বিঁধবা !

মোহিনী বলেছিল, বেশ ! আমার কথায় যদি এমুন দহন, তয় আমি কমু না কথা।

সেদিনের রাতে মোহিনী বলেছিল, মাইনষেরে কই না, কাগাবগারে কই, ত্যাল ফুরাইছে, আর হেরিকেনডা সারাইতে হইব।

বড় দুঃখে সদান্দন বলেছিল, উৎরুমির মেলায় আমারে গলায় মালা দিছিল কি কাগাবগা ? এই আমি নৌকায় ফিরি কিনা দ্যাখতে জামির গাছের নীচে আইয়া পড়ত কি কাগাবগা ? এই সেদিনও আমার জ্বর হইতে হেরিকেন নিয়া ডাক্তার আনছিল কি কাগাবগা ?

মোহিনী নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, কাগাবগারে কই, এমুনই ভাল। মুখ খুললে আমি থামতে পারি না। বুক হুতাশে পুড়ে। আর কওন বলনের আছে-বা কী ?

সেই থেকে মোহিনী চুপ হয়ে যায়। সদানন্দ এ ব্যবস্থা ক্রমে মেনে নেয়। এমনি করে ষোল বছর কাটল। সদানন্দও সন্ধ্যায় ফিরে বলে, কাগাবগারে কই ! চালের দাম কিন্তুক বাড়ত্যাছে খুব। তা ক্লাবের বীরেন কয়, কাকা ! পাঁচকাঠা রাইখা কী করবেন ? দেন তিন কাঠা বেইচা।

—কাগাবগা জানে না, এ কাজ বেআইনি নয় ?

—কাগাবগা এও জানে, যে যখন বীরুর নজর লাগছে, জমি ও এমুনি নিতে পারে। অহন তাদের রাইজ্য। যা দেয় হেই লাভ। দেউক, যা হয় দেউক।

—কাগাবগার যা মন লয় করুক। দ্যাশের রাজ্যপাট গেল তাই কিছু কই নাই ! হাল-বদল গাই, যেমন অনেকের ছিল। তাকে 'রাজ্যপাট' বলে না।

বরঞ্চ আস্তে বলে, কাগাবগারে কই, চুয়াত্তর চলত্যাছে, আমি আর কতকাল ! দুটা পয়সা থাকলে থাকব। ঘরখান সারিসুরি কইরা নিলে একখানা ভারাও দিতে পারে। অরা কইরা নিলে থানাও দেখত না।

মোহিনী বলে, কাগাবগারে কই, টাকা যেমুন পোস্টাপিসে থোয়, আমিও সই দিমু।

—তাই হইব।

বীরু, চট্টরাজ ভটভটিয়া চেপে চলে আসে। বড় রাস্তার প্রায় ওপরে জমি। বীরু দোকান করে ছেড়ে দেবে। ওর বাবা এবং ও, এভাবে অনেক জমি সংগ্রহ করেছে। এরা তো বুড়োবুড়ি, ডরপোক মানুষ, ছেলেরা দেশান্তরী। বুড়োটা জানে, এমন জমিও এখানে আট হাজার টাকা কাঠা। তবে তা চাইতে সাহস করবে না।

—কাকা ! বলেন কত নিবেন ?

—তুমি তো জানই দর !

মোহিনী বলে, ক্যান্ ? যেমুন দরে বেচলা তোমার দুই কাঠা, তাই দাও। পাল তো ষোল হাজার দিচ্ছে।

বীরু হাসিতে ঢলে পড়ে। এখন কৌতুক করে বলে, কাগাবগা কী বইলা গিছে কাকি ?

মোহিনী মাথা নাড়ে।

—কাগাবগার কথা, ঘরের কথা ! ওই কথা আর কেউর জন্য নয়। টাকা যদি না দাও বীরু, বুড়াবুড়িকে মাইরা সগলটি লইয়া লও। টাকা লাগত না।

—তা কই না কাকি। তয় কাকা-কাকি সম্বোধন। বিবেচনা করতে কই। অত তো পারতাম না।

বীরুর হিসেব ছিল পাঁচ হাজার। মোহিনীর জেদাজেদিতে শেষ অবধি ওতে দশ হাজার এক টাকা দিতে হয়। মনুষ্যস্বভাবের নিয়মে, বীরু ওদের চোদ্দ হাজার টাকা ফাঁকি দেয়, তবু নিজেকে মনে হয়, 'ঠকে গেলাম গো' !

দিনে দিনেই ওরা পোস্টাপিসে গিয়ে টাকা জমা দেয়। যুগ্ম সাক্ষর। ডাকবাবুও চেনা।

এখন মোহিনী বড় ব্যাবুঝ জেদ ধরে।

—কাগাবগারে কই, ঘরখানা সারুক।

—কত টাকা লাগব তা—কাগাবগা জানে না ?

—হিসাব নিছি আমি, দ্যাড় হাজার লাগব।

—কাগাবগা কি পরে কী হইব তা ভাবে না ?

—কাগাবগারে কই, বড় ইচ্ছা আস্তা ঘরে থাকি, বড় ইচ্ছা চৈকি নতুন কিনি, বড় ইচ্ছা কাসার গেলাশে জল দেই, জল খাই। সকল হুতাশ রাইখা মরলে আবার জনম লইতাম। আর না। হুতাশ মিটলে আর জনমাইতে হয় না।

—কাগাবগারে এ কথা কে কইছে ?

—কাগাবগারে কই ? হরিসভায় কুনোদিন যায় নাই,গেলেই শুইনা আইত। বীরুর বাপের হুতাশ আছিল, রেডিওর দোকান দিব। বীরু সেই হুতাশ মিটাইতেছে।

—কাগাবগারে কই, হুতাশ আমি রাখতাম না।

—কাগাবগারে কই, ঘর সারলে নতুন চৈকিতে লক্ষ্মী বসামু। কুনোদিন ছাওয়ালদের...

—অমঙ্গল হইব না !

—কাগাবগারে কই, কালই যেমুন মলন্দিরে খবর দিয়া তয় কিষ্টনগর যায়। সে জনা পুরানা মিস্তিরি।

'কাগাবগারে কই' কথাটি এখানে সবাই জানে। কিন্তু এ জায়গার মানব মানচিত্র খুবই পুরনো। নতুন নতুন মানুষজন দূরে ঘর বেঁধেছে। পুরনো কলোনির মানুষজন তেমনই আছে।

মলন্দি এসে দাঁড়ায়।

—ঘর কি ফালাইয়া নয়া তোলবেন.?

—তাই কি পারি ?

—আমিই তোলছিলাম। দ্যাখেন, মাটির দ্যাল দিছিলাম বইলা আজও কেমুন.. এ দ্যাশে মাটির ঘর দ্যাখলে শোনলে দিন যায় শক্ত হয়।

—পুরানা টিন দ্যাখো মলন্দি।

—পুরনোরাও তো....

—দ্যাহ তুমি বারিন্দা এবার বাড়ইমু।

—ছাওয়ালরা আসব ?

মোহিনী হাসেন। বলেন, কাগাবগা ডিম ফোটায়, ছা পালে, সগল পক্ষীর কথা কই। চক্ষু ফুটল, উড়তে শিখল, তখন পক্ষীর ছা উড়াল দেয় গো মলন্দি। বাসায় ফিরে না।

মলন্দির মনে হয়, বুড়োবুড়ির শেষ জীবনে শুধু নিজেদের জন্য ঘর পাকাপোক্ত করতে চাওয়াটা বড় বেহিসেবি কাজ হচ্ছে। কতদিন ভোগ করবেন ?

ওর মনের কথা বুঝে মোহিনী বলেন, মনুর বাপ দুঃখ তো কত করল বৎসর ! তোমরা আমাদের গরিবই দেখছ ! বলতেও ইচ্ছা যায় না। এক সময়ে ওই মানুষ কাঁঠাল কাঠের চৌকিতে ঘুমাইছে, মাঘ মাসে সার্জের কোট আর শাল গায়ে দিছে, ভাতের পাতে নিত্য পরমান্ন খাইছে ! সগলই...নাও, ঘর দেখো, বুইঝা শুইঝা সারাইবা। বেঙের আধুলি !

—জমি বেইচা মা কত পাইলেন ?

—হ, লক্ষ টাকা পাইছি।

—আমারে কত দিবেন ?

—সে জনা আসুক। কথা কইয়া লইও।

মলন্দিও নিশ্বাস ফেলে।

—ঘরের বাসন তৈজস তো দেখত্যাছি। ঠাইকরেনের ঘরেও চোর পড়ে না, আমার ঘরেও না। অহন তো ঘর বান্ধার মানুষ বিস্তর। বানাও কইতরের খাঁচা। আমি কাম পাই না। বীরুবাবুরা ক্লাবঘরটা বানাইয়া লইল, দিল যা...ঘর আমি লৈতন কইরা দিমু। পাকা খুঁটা দিছিলাম, দুখানা পালটাইতে হইব। পুরানা টিন...দেখি সারগাছির বাবু যদি....

বড় আতিপিতি ধায় মলন্দি এদিক ওদিক। বড় তাড়া দেন মোহিনী। সদানন্দন বর্তমানে বসেন লটারির টিকিটের দোকানে। এখন লটারির দিন। মোহিনী কাঠের ঘেঁসের গুল দেন। কেমন করে যেন ওঁদের ব্যবধান ঘুচতে থাকে। মোহিনীর কথাবার্তা যেন অন্যরকম হয়।

—কাগাবগারে কই! চাউলের দাম যখন কম, তখন যদি কিনা থোয়, একখান ঘরে বইয়া তো চাউলই বেচা যায়।

—কাগাবগারে কই, এই বয়সে চাউলের জন্য ঘরে ডাকাত পড়লে ঠেকাইতে পারতাম না।

—তয় খাতা পিনচিলের দোকান দিতে বলি কাগাবগারে। এই বয়সে কিষ্টনগর আর কেন?

—কাগাবগারে কই ভাইবা দেখুম।

বীরুর দোকান ধাঁ ধাঁ করে ওঠে, উদ্বোধনের দিন সদানন্দের ঘরেও মিষ্টির বাক্স আসে। দোকানের নাম 'লালি' এবং সারাদিন সেখানে রেডিও মেরামতির আওয়াজ চলে ও দূরদর্শনে বাংলাদেশের প্রোগ্রাম দেখতে ভিড় জমে।

মোহিনীর ঘর সারাই হয় ধীরে ধীরে। মলন্দি তার সম্বন্ধীকে নিয়ে আসে এবং এমন সযত্নে ঘরটিকে নতুন চেহারা দেয়, যেন ওরা তাজমহল বানাচ্ছে, যা ওদের অমর করবে।

দেড় হাজারে হয় না, দু-হাজার মত লাগে। কিন্তু বারান্দা চওড়া হয়, সেও মাটির দেয়ালে ঢাকা, তাতেও কপাট আছে, খুপরি দুটি জানলা। মাটির দেয়ালই চুনকাম হয়। পুরনো টিন মলন্দি অনেক চেষ্টায় জোগাড় করে।

উঠোনে তুলসীমঞ্চ।

মোহিনী এই প্রথম একটি স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখেন। বড় নরম গলায় বলেন, কাগাবগারে কই। চৈত্রে-বৈশাখে তুলসীতে ঝারা বাধুম বারিন্দায় কোলে জবা, গেঁদা, অতসী, দোপাটী, পূজার ফুল আর অন্যের বারি হইতে।

সনানন্দ ক্ষীণ হাসেন।

—কাগাবগারে কই, একদিন হরিসভায় শীতল দিক।

—কাগাবগা বলুক, লক্ষ্মী পাতুম, চৈকি!

—আর কাসার গিলাশ?

—কাগাবগারে কই! সে হুতাশ আর নাই। ঘর মনের মত হইছে, সগল হুতাশ শান্তি!

—আর লক্ষ্মী পাইতো?

—আবাইগারা কাছে থাউক, দূরে থাউক, তাগারো যেমুন অমঙ্গল না হয়, তাগারো বাপ যেমুন এট্টু শান্তি পায়, আমার সিন্দুর যেন থাকে!

কাগাবগারে কই! আমার দেহ তো আর বয় না। কিষ্টনগর আইতে যাইতে নাভিশ্বাস। না গেলেও নয়।

মোহিনী ঘরটি নতুন করার পর যেন অপার ক্ষমতাশালিনী দেবী। তিনি অশেষ

করুণায় বলেন, হেই দুঃখ বেশিদিনের নয়। কাগাবগা বইলা দিক।

—কাগাবগা কী স্বপ্নাদেশ শুনাইছে?

—কাগাবগা বইলা দিক, হেই কষ্ট বেশি দিনের নয়।

তুলসীমঞ্চ বাঁধতে বাঁধতে মলন্দি ভাবে, স্বামী-স্ত্রী! সরাসরি কথা বলে না কেন?

বউকেও ও শুধোয়। মলন্দি যদিও দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত নিভুঁই নিচাষি লোক, তবু ভারতের শ্রেষ্ঠ উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ও একজন নেতা। ভারত-ভূমিকে ও এগারটি সন্তান উপহার দিয়েছে। করকরে টাকার লোভে অপারেশন না করালে ও আরো ফসল ফলিয়ে যেত। ওর মন কৃষিকাজ জানে না, শরীর জানে।

বউ বিরক্ত হয়ে বলল, ঠিকই করে। তোমার মত রাত্রিদিন 'কই গেলা হলার মা? কই গেলা, ধলার মা', বইলা চেঁচায় না।

মলন্দির হলা-ধলা-মলা-রানী-মেনি মুচকন্দ, ওরা সাতজনই ছটকে পড়েছে। শেষের চারজন দোকানে-বাজারে সাট্টার ঠেকে করে খাচ্ছে।

মলন্দি সহসা গভীর জ্ঞানে আলোকিত হয়।

—ঠাই করেন বুঝি কী পাইছে স্বপ্ন! অহন কথাও কেমুন, সগলডি যেমুন পরিবর্তন। নিত্য 'কাগাবগা আয় আয়' ডাইকা ভাত ছিটায় উঠানে, আবার সকড়ি মুক্ত করে।

বউ নিশ্বাস ফেলে বলে, পাউক, শান্তি পাউক! দুই পোলা থাইকাও নাই, বুড়াবুড়ি বড় কষ্ট পাইছে!

বস্তুত ঘরটি করতে পেরে মোহিনী এক অবাস্তব আত্মবিশ্বাসে ভোগেন। ঘর হবার কথা নয় হল। পোস্টাপিসে আট হাজার টাকা থাকার নয়, আছে! তাহলে সদানন্দ যাতে এখানে কোনো কাজ পান, তাও হবে। মনুর বাপ একশত টাকাই আনুক, আমার ঘেঁসের গুলের তো বান্ধা খরিদ্দার। বারিন্দার এক কোনা ভইরা রাখছি। আমরা চালাইয়া নিব অরি মধ্যে। এই বয়সে কিষ্টনগর! বাসে তো লাচাইতে লাচাইতে যায়। অই হাড় কখান? দেহে আছে কী!

বীরু চট্টরাজ এমআর শপ, কেরোসিন, সব কিছুর ডিলার। তদুপরি সে পঞ্চায়েত প্রধানকে পরিচালনা করে।

তার কাছেই যান মোহিনী।

—বীরু! তোমার লিগগা আমার ঘর হইল। আজ জল পড়ে, কাল সাপ পড়ে, সে হইতে মুক্তি পাইলাম অহন...

—কি, বলুন?

—মনুর বাপরে একটা দোকানের কামও যদি দিতা!

—আপনি চাইলেই হয়।

—চাইত্যাছি তো!

—কাকার বয়সে ....বসতে পারে দোকানে....'লালি'তেই বসুক না, আমি লটারির টিকিটের দোকানও করুম 'লালি লটারি।' তা কাকিমা টাকা ফেলেন কিছু, কাম হইব।

—টাকা কোথা, বীরু?

—আরে, ডাক ঘরে থোন নাই ?

—সেই টাকা !

—সঙ্গে লইবেন নাকি ?

বীরু খুব হাসে। যাক কৃষ্ণনগর যাক আর আসুক। বুড়ো মরলে বুড়ির কাছ থেকে—

মোহিনীও হাসেন।

—না বীরু ! সঙ্গে আমরাও লইব না, তুমিও লইবে না। যাউক গা, বইলা গেলাম, দেইখো।

—দেখুম অবশ্যই কথা দিতে পারিত্যাছি না। যুবরাই ব্যাকার, বুড়াদের কাম কি হয় ? আমি দেখেন না, কতগুলানরে কামে লাগাইছি। আমার কারবার, অরাও কইরা খাউক।

—হ্যাঁ বীরু, চলি।

সন্ধেবেলা আদা-চা আর মুড়ি নামিয়ে দিয়ে মোহিনী বলেন, কাগাবগারে বলি,গরম গরম খাউক। আর বলি, কিষ্টনগরে যাওন ছাইরা দিক। বারিন্দায় বইসা গুল বেচুক। আমি মলিন্দার এট্টা পোলারে পাইলে ডবল গুল দিতে পারি।

সদানন্দ জবাব দেন না। চা-টুকু তারিয়ে তারিয়ে খান। তারপর বলেন, কাগাবগারের কই, নতুন চৈকি আনতাম কবে ?

—কেন, বুধবার ?

—তয় বুধবার। কাগাবগারে কই, কিষ্টনগর যামুই না ওই মাস হইতে। কোম্পানি বলছে, হপ্তায় একবার আইয়েন, টিকিট লইয়া যান। আপনার হাতের টিকিটে পাঁচ হাজার টাকা, দুইহাজার টাকা, দুবার উঠেছে। ঘরে বইসা বেচেন।

মোহিনী অবাক হয়ে যান। তিনি যা চান তাই হচ্ছে ?

—কাগাবগারে কই, এই বুধবারই আনুক।

বুধবারই নতুন চৌকি আসে। বাবুদোলের মেলায় কেনা-লক্ষ্মী, কাঠেরপেঁচা, মৃতা শাশুড়ির পায়ের আলতাছাপ, সকলেরই জায়গা হয়ে যায়। জীবনে এই প্রথম, পোকায় কাটা তসর পরে মোহিনী প্রতিবেশিনীদের ডেকে আনেন। নতুন চৈকিতে লক্ষ্মী বসাইলাম। যাইয়েন দিদি। মায়েরে একটু রান্না ভোগ দিমু, গাঙ্গুলি বউ রানব।

জমি বেচা, ঘর সারানো, ইত্যাকার কারণে ঈর্ষায় জ্বলে থাকা প্রতিবেশিনীরা বলেন, যামু দিদি।

সদানন্দ বিষ্যুৎবার আর বেরোন না।

—কাগাবগারে জিগাই, দেহগতিক ভাল তো ?

—কাগাবাগারে বলি, কেমন জানি লাগে।

মোহিনী কপালে হাত রাখেন। না জ্বর নয়।

—কাগাবাগারে কই ! আজ শুইয়া থাউক। কাল তারে লইয়া যামু ডাক্তারের কাছে।

—কাগাবগা বলুক, ডাক্তার দেখানোর কী হইছে ?

—কাগাবগারে কই, শুইয়া থাউক। বিশ্রাম তো হয়ই না। বয়স অহন বাড়ত্যাছে।

—ধইন্য কাগাবগা। বাড়ির নামই হইছে কাগাবগার বাড়ি। তারা নাকি রোজই খাইয়া যায়।

—কাগাবগারে কই। তাগারো নাম লইতেছি লক্ষবার, পাতের ভাত এক মুষ্টি।

—কাগাবগারে কই, পূজার জোগাড়ে, যাউক।

বড় সুন্দর পুজো হয়। শস্তা ধূপকাঠির গন্ধে, প্রদীপের আলোয় পুরনো লক্ষ্মীর মুখ বড় প্রসন্ন দেখায়।

গাঙ্গুলি বউ বলে, এবার ইলেকট্রিক নিন মাসিমা।

—অনেকটি টাকার কাম মা !

—কিসের টাকা ? সামনে পোল। শুধু তার টানবেন।

গাঙ্গুলি গিন্নি বলেন, পুজোর বাসনও কিনুন দিদি। জমি বেচলেন, ঘর সারালেন,টাকা রেখেছেন, অমন ফঙ্গবেনে বাসনে লক্ষ্মীপুজো হয় ? আমি তো স্টিলের বাসন কিনেছি।

মনোরঞ্জনের বাল্যবন্ধুর মা বলেন,এই তো বেশ। মন চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা, কথায় বলেছে।

মোহিনী নম্র হেসে বলেন, যে যেমন পারে দিদি !

সদানন্দও পিছনে বসে পুজো দেখেন, প্রসাদ খান। রাতে শুয়ে শুয়ে বলেন কাগাবগারে কই খিচুড়ি যেমুন দ্যাশের মত খাইলাম। বড় ভাল পাক করছে বউটা ?

মোহিনী বলেন, কাগাবগা জানি আরেকজনরে ঘুমাইতে বলে। আমারও ঘুম ধরছে যা ! দেহ যেমন সাপের বিষে অবল !

—তয় ঘুমাক।

মোহিনী ঘুমে ঢলে পড়েন। কী ঘুম, কী ঘুম ! যেন লোহার বাসরে বেহুলার চোখের কালঘুম। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বেহুলার কথা মনে হল কেন ?

বেহুলার ঘুম কখন ভেঙেছিল ?

মোহিনীর ঘুম ভেঙেছিল, গোঙানির শব্দে। লাফিয়ে মশারি তুলে নেমে হ্যারিকেন উসকে দেখেছিলেন সদানন্দ বুকে হাত রেখে গোঙাচ্ছেন। কাকের ডাকে বুঝেছিলেন কাকভোর।

উতলা, বিহ্বল মোহিনী বলেছিলেন, কাগাবগারে কই, কোথায় ব্যাদনা ? অমন করে ক্যান্ ?

তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে 'লালি' দোকানের পাহারাদারকে ডেকেছিলেন। তারপর ছুটেছিলেন ডাক্তারের বাড়ি। শীঘ্র চলেন গো ডাক্তারবাবু ! সে মানুষ জানি কেমুন করত্যাছে।

ডাক্তার আসতে আসতে পাশের বাড়ির লোকজনও এসে পড়ে। মোহিনী বলেন, দ্যাখেন দ্যাখেন ভাল কইরা।

তারপর ঝুঁকে পড়ে ডেকেছিলেন, কাগাবগারে কই না, তোমারে কই, শুনত্যাছ ? কথা কও না কেন ? কারে খুঁজ ?

ডাক্তার বলেছিলেন, সরে যান, দেখতে দিন।

মোহিনী মুখ আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন।

—এরকম ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক—

—কার কথা বলছে ডাক্তার ?

—প্রেসার দেখাতেন না ?

—একবার দেখাইছিল।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল।ঘরের চারদিকে তাকাল। তারপর বলেন, সঙ্গে কেউ আসুন।

—কেন ?

—স্যার্টিফিকেট দেব। কাল কী খেয়েছিলেন ?

—ঠাকুরের ভোগ....

ডাক্তার মাথা নাড়েন।

—প্রেসার হঠাৎ বেড়ে, না কি বাড়ছিল....

—সে নাই ?

সবাই খুব বিব্রত অপ্রস্তুত।

গাঙ্গুলি গিন্নি বলেন, পুণ্যবান গো ! পড়ে থাকলেন না, সেবা নিলেন না। কেমন নিমেষে..

মোহিনী এখন হা করে কেঁদে বসে পড়েন।

—আমি কেন-বা নিয়ম ভাঙলাম ? কাগাবগারে মধ্যস্থ রাইখা কথা কই কত কাল, কেন সে কথা ভোললাম ? কেন-বা মধ্যস্থ রাখছিলাম ? কাগাবগা রে ! তরাত উড়াল দিবি, ডাইকা ফিরবি, তদের মাঝখানে রাইখা আমি কার লগে কথা কমু ? কার লগে ?

সকলে মনে করে এটা শোকের প্রলাপ। কেউ ছেলেদের ডাকতে যায়। ঘর ভরে যায় মানুষে।

—কাগাবগার পাঁচালি শ্যাষ কইরা দিলে,আমি কী লইয়া ভোলব ?

এ কথার উত্তর হয় না। সকাল হয়।

পাখপাখালি ডাকে।

মোহিনী কানে হাত চাপা দেন।

—আর ডাকিস না রে কাউয়া ! কাগাবগা ধইরা বলার মানুষ চইলা গিছে, অহন তর ডাক আমারে বিন্ধে।

কাক ডেকে চলে, ডাকাই তার কাজ।

কাগাবগার গীতিকা এমনি করেই ফুরায়।

অথচ সকালটি বড় সুন্দর ছিল।

অঙ্কে মেলে না

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গাড়ি আগেই লেট চলছিল। খড়গপুর স্টেশনে এসে একেবারে যেন পঙ্গু হয়ে গেল।

শিবতোষ প্রথমটা গ্রাহ্য করেননি। ট্রেন একটু-আধটু দেরি করবে তাতে আর বিচলিত হবার কি আছে। তিন ঘণ্টার জায়গায় না হয় চার ঘণ্টা লাগবে। তাঁর একেবারে ঘড়িধড়া কোনো কাজ তো নেই। কলকাতায় পৌঁছলেই হল বেলাবেলি।

মানসের একটু কষ্ট হবে অবশ্য। প্ল্যাটফরমে এসে ঘণ্টাখানেক বেশি অপেক্ষা করতে হবে।

তা একদিন হলই-বা একটু ঝামেলা পোহাতে।

তিনি যে এই বয়সে তাদের জন্যে সব ঝামেলা পোহাতে আসছেন।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই অস্বস্তিটা যেন বুকের ভেতর ঠেলে উঠল।

সত্যি কেন তিনি যাচ্ছেন ! সাধ করে এই প্রায় আজগুবি দায় কাঁধে নেবার কোনো গরজ যথার্থ তাঁর আছে কি ?

যমুনা ? শুধু যমুনার জন্যে যাচ্ছেন বলে নিজের মধ্যে একটা গাঢ় গভীর অনুভূতির দোলা অবশ্য পেতে পারেন। কিন্তু তা-ও ঠিক পাচ্ছেন কি ?

ব্যাপারটা তেমন হলে যে নেহাত ছেলেমানুষী হয়। একটা সস্তা নাটুকে উচ্ছ্বাস !

যমুনা বলতে একদিন অজ্ঞান ছিলেন সত্যিই। বয়সে নেহাত ছেলেমানুষ, সস্তা নাটক-নভেল পড়া প্রেমের ছাঁচেই তাই মনটা ঢালা ছিল তখন।

সে ভালবাসা অবশ্যই মিথ্যে ছিল না, কিন্তু এই ষাট বছরের অনেক টোল খাওয়া পালিশ ওঠা বুকের ভেতর সেই ভালবাসারই অর্নিবাণ শিখা আজও জ্বলছে বললে নিজের কাছেই ঠাট্টার মত শোনায়।

ছেলেমানুষী ব্যাপারটা অবশ্য যতখানি সম্ভব গুরুতরই হয়েছিল সেদিন। নাটুকে প্রেমের ধরনেই,পরস্পরকে না পেলে দুজনের কেউ জীবনই রাখবে না এ ধরনের কড়া কড়া সব শপথ নেওয়া হয়েছিল গোপনে।

যমুনা তখন পদ্মাপারের এক বছরে বর্ষার-বানে-ভাসা গাঁয়ের মেয়ে। শিবতোষ সেই গাঁয়েরই ছেলে। কলকাতায় মামার বাড়ি থেকে পড়াশুনো করে। বছরে একবারই যেতে পারে গাঁয়ে। পুজোর ছুটিতে।

বর্ষার উপছে পড়া নদীর জলে গ্রাম তখনো থইথই করে। এক-একটা বাড়ি দ্বীপের মত ভাসে সেই অকূল জলে। চলাফেরা সব নৌকোয়। সুযোগ-সুবিধে খুব বেশি ছিল না। তবু দেখা হত। ইচ্ছে থাকলে সাহস থাকলে কি না হয়।

দুজনের মধ্যে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গিয়েছিল। শিবতোষ পাস করলেই চাকরিতে